যুগান্তর

তারিখ 01 APR 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

সরকারি স্কুলে হযবরল

শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার— আর সেই অধিকারের চেহারা সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে। শিক্ষা হয়ে উঠেছে সবচেয়ে লাভজনক বাণিজ্য। 'শিক্ষাপণ্য' ক্রয়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগই পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ। যেখানে সুষম সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার ভূমিকা রাখার কথা, সেখানে সূচনাতেই সেটা হয়ে উঠছে অসম সমাজ গঠনের মাধ্যম। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার গলদের কারণে ছিটকে পড়ছে যেমন দরিদ্রের সন্তানরা, তেমনি শিক্ষা পদ্ধতির চোরাবালির গর্তে হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রী। এখন মেধার অন্য নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ। যার অর্থের দাপট যেমন, সে তেমন মেধাবীর সার্টিফিকেট অর্জন করছে। আখেরে অর্থমূল্যে ক্রয় করা এ সার্টিফিকেট কারও কাজে আসছে না— না অর্জনকারীর, না প্রদানকারীর। না পরিবারের, না দেশের।

অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে গত দু'দশকে সনাতন শিক্ষা পদ্ধতির জায়গায় যে আধুনিক পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, সে পদ্ধতি সৃজনশীল। এর মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরি এবং তাদের মনন, চিন্তা, মানসিকতা বিকশিত হওয়ার কথা; শিক্ষার প্রকৃত মান নিশ্চিত হওয়ার কথা। কিন্তু সেটি তো অর্জিত হচ্ছেই না, বরং ঘটছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর কারণ কী? একটি তীক্ষ্ণ ছুরি একই সঙ্গে জীবন রক্ষা এবং জীবন হননের কারণ হতে পারে— সেটি কার হাতে এবং কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে তা নির্ভর করে সিদ্ধান্তের ওপর। এ ক্ষেত্রেও ঘটছে তাই। শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। পদ্ধতিটি খুবই আধুনিক ও ইতিবাচক। কিন্তু বাস্তবতা হল, এ পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকরাই সম্পূর্ণ জ্ঞাত নন। একই ঘটনা ঘটেছিল এর আগে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে। আধুনিক এ শিক্ষা পদ্ধতিও শিক্ষকরা আত্মস্থ করার আগেই প্রবর্তন করার ফলে সেটি হয়ে দাঁড়িয়েছে ৫০০ প্রশ্নের অন্ধকূপের শিক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষার দুটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি এ দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে অদক্ষতার সঙ্গে। শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে আমরা ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা কাঠামো দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে চাচ্ছি। শিক্ষা নিয়ে সব তৎপরতা এখনও রয়ে গেছে সৈয়দ মুজতবা আলীর সেই গল্পের মতো : এখনও শিক্ষা ক্ষেত্রে সাহেবের তিন ঠ্যাঙে কুকুরের জন্য পঁচাত্তর টাকা বরাদ্দ রেখে পণ্ডিতের জন্য বরাদ্দ স্থির করা হচ্ছে পঁচিশ টাকাই। ফলে সর্বাধুনিক পদ্ধতিও হয়ে যাচ্ছে অকার্যকর। অন্যদিকে পণ্ডিতেরা এখন আর প্রশ্নোত্তরের অপেক্ষায় নেই— তারা তিন ঠ্যাঙের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছয় ঠ্যাং অর্জনে মনোযোগী হয়েছেন। ফলে তারা এখন আর শিক্ষায়তনে পাঠদান করেন না, পাঠদান করেন কোচিং অঙ্গনে। শিক্ষা এখন আর আলো নয়, কেরোসিনে পরিণত হয়েছে। যার যেটুকু সামর্থ্য সেটুকু ক্রয় করছেন।

গতকাল যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সরকারি স্কুলে শিক্ষার হযবরল চিত্র উঠে এসেছে। এতে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পাঠদানের বদলে রমরমা কোচিং বাণিজ্য বন্ধের জন্য মন্ত্রণালয়ে কতিপয় সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, সেসব সিদ্ধান্ত শান্তিস্বরূপ ঠিক আছে। কিন্তু শাস্তির ভয় দেখিয়ে শিক্ষকদের এ বাণিজ্য বন্ধ করা যাবে কি? ইতিপূর্বে যে বন্ধ করা যায়নি, সেটা এর আগে নেয়া সিদ্ধান্ত থেকেই প্রমাণিত। সন্দেহ নেই, এবারও তারা মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ক্ষমতাধরদের ঢালে পরাস্ত করবেন সিদ্ধান্তগুলো। তাতে হযবরল অবস্থা দূর হবে না।

এ নৈরাজ্যজনক বাস্তবতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার প্রকৃত মানোন্নয়ন করতে হলে শিক্ষকদের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে। যাদের ওপর জাতি গঠনের দায়িত্ব তাদের শান্তির পর্তে নয়, তাদের অন্তর্গত শিক্ষক সত্তাকে জাগ্রত করার শর্তে উদ্বুদ্ধ ও প্রাণিত করতে হবে। তাহলেই তাদের মধ্য থেকে পরবর্তী প্রজন্মের পথপ্রদর্শক শিক্ষক পাওয়া যাবে। আমরা মনে করি, শিক্ষাঙ্গনের হযবরল অবস্থার অবসানের জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সচেতন ও উদ্যোগী হতে হবে। বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও মমত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।